হলোকস্টের দিনলিপি / ১

সীমন্তিনী গুপ্ত

মাসখানেক আগের কথা। অফিসে বসে রোজকার মতো সন্ধেবেলা নানা ওয়েবসাইট ঘাঁটতে ঘাঁটতে চোখে পড়ল কয়েকটা লাইন— ‘‘On this day, 72 years ago, Anne Frank and her family were arrested by the Gestapo in Amsterdam, then sent to Auschwitz. Anne and her sister Margot were later sent to Bergen-Belsen, where Anne died of typhus on March 15, 1945.’’

নেহাতই একটা তথ্য। তবে এমন এক জনকে নিয়ে, যার ‘The Diary of a Young Girl’ পড়েননি, আমার পরিচিতি-পরিধির মধ্যে এমন মানুষ কমই। তবু এক বার ‘গল্পটা’ ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

১৯৪২ সালের ১২ জুন, তার ১৩ বছরের জন্মদিনে, একটা ডায়েরি উপহার পেয়েছিল আনেলিস মারি ফ্রাঙ্ক। তার দিন কয়েক বাদেই, জুলাই মাসের ১৫ তারিখ, নাৎসিদের হাত থেকে বাঁচতে, বাবার দোকানের চোরাকুঠুরিতে মা, বাবা, আর দিদির সঙ্গে লুকিয়ে পড়ে আনে। আর একটি পরিবারও সঙ্গ নেয় তাদের। সেই চোরাকুঠুরি থেকেই, ২৫ মাস পরে, আনেদের বন্দি করে নাৎসি পুলিশ। কোনও পরিচিত লোকই ইহুদি পরিবার দু’টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তার পরে আউশভিৎজ হয়ে বের্গেন-বেলসেন। দু’টো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প ঘুরে ষোলো বছরের জন্মদিন আসার আগেই শেষ হয়ে যায় তার জীবন।

চোরাকুঠুরি থেকে আনের ডায়েরি খুঁজে পেয়ে যত্নে রেখে দিয়েছিলেন তার পরিচিত এক মহিলা। ইচ্ছে ছিল, আনে ফিরলে তাকেই ফেরত দেবেন। আনে ফেরেনি। তবে যৌথ বাহিনীর হাতে নাৎসি বাহিনীর পরাজয়ের পরে আউশভিৎস থেকে যে ইহুদিরা মুক্তি পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আনের বাবা ওটো ফ্রাঙ্ক। ১৯৪৭ সালে মেয়ের ডায়েরি তিনিই প্রকাশ করেন। প্রথমে ছাপা হয়েছিল দেড় হাজার কপি। তার পরে প্রায় ৭০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে ডায়েরিটি, বিক্রি হয়েছে তিন কোটি কপিরও বেশি।

আনের কথা বলতে বলতে মনে পড়ে গেল ইৎশোক রুদাশেভস্কির কথা। কিছু দিন আগে আর একটা খবরে চোখ আটকে গিয়েছিল। লিথুয়েনিয়ার এক কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের ইহুদি বন্দিরা হাত দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেলেছিলেন। পালানোর জন্য। সেটা প্রায় ৭০ বছর আগের কথা। সম্প্রতি লিথুয়েনিয়ার পোনারি শহরে (যার এখনকার নাম

পানেরিয়াই) একশো ফুট লম্বা এই সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন পুরাতত্ত্ববিদেরা। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে যে অনেকে পালাতে পেরেছিলেন, সেই প্রমাণও মিলেছে। লিথুয়েনিয়ার এই পোনারি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে এক লক্ষ ইহুদিকে মারা হয়েছিল।

এই পোনারি ক্যাম্পেই ছিল ইৎশোক রুদাশেভস্কি। ১৩ বছর বয়সে এই ইহুদি ছেলেটিকে প্রথমে লিথুয়েনিয়ার ভিলনা (অধুনা ভিলিনিউস, লিথুয়েনিয়ার রাজধানী) গেটোয় নিয়ে যায় নাৎসি সেনারা। ইৎশোকদের মতো বহু ইহুদি পরিবারকেই শহরের একটা অংশে গেটো বানিয়ে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। সেখানেই পড়াশোনা চালাত ইৎশোকের মতো ছেলেমেয়েরা। আড়াই বছর সেই গেটোয় থাকার পরে তার 'ঠাঁই' হয় পোনারি ক্যাম্পে। সেই ক্যাম্পেই ১৯৪৪-এর ১ অক্টোবর গুলি করে মারা হয় তাকে। তখন তার বয়স ১৬।

হলোকস্টে ৬০ লক্ষেরও বেশি ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল, আর তাদের মধ্যে ১৫ লক্ষই ছিল শিশু ও কিশোর-কিশোরী। সেই সব হতভাগ্যের মধ্যে দু'জন এই আনে ও ইৎশোক। দুই কিশোরবয়স্কের মধ্যে সাযুজ্য অনেক। তার একটা অবশ্যই— বন্দিদশায় (এক জন চোরাকুঠুরি আর অন্য জন নাৎসিদের তৈরি করে দেওয়া গেটোয়) থাকাকালীন তাদের ডায়েরি লেখার অভ্যাস। ১৯৪১-এর জুন থেকে খুন হওয়ার কয়েক মাস আগে পর্যন্ত রোজনামচা লিখে গিয়েছিল ইৎশোক। তার দিনলিপিতে ফুটে উঠেছে নাৎসি অধিগৃহীত ভিলনার ছবি। তার ডায়েরির শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল, ১৯৪৩। অনুমান করা যায়, তার পরেই তাকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার কয়েক সপ্তাহ পরেই গুলি করা হয়।

ইৎশোকের মৃত্যুর বছরখানেক পরে সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে থাকা তারই এক তুতো-ভাই ভিলনা গেটোতে খাতাগুলো খুঁজে পায়। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেই ডায়েরি। আনে ফ্রাঙ্কের মতো জনপ্রিয়তা হয়তো পায়নি। কিন্তু ইতিহাসের দলিল হিসেবে তার গুরুত্ব কিছু কম নয়। ইজরায়েল থেকে প্রকাশিত সেই ডায়েরির ইংরেজি অনুবাদ হাতে এসেছিল। তার থেকেই কয়েকটি অংশ, বাংলা অনুবাদে, আমার এ বারের দু'কিস্তির ব্লগ-নামচা। ইৎশোকের ডায়েরির খোঁজ পেয়েছিলাম 'আরম্ভ' পত্রিকার সম্পাদক বাহারুদ্দিনের কাছে। এই লেখাটির জন্য তাঁর কাছে ঋণী রইলাম।

২১ জুন ১৯৪০

আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে হিটলারের অনুগামীরা। জোর করে আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে তারা। আমরা এর উত্তর দেবোই, ওদের ঔদ্ধত্যের জবাব দেবো। ওদের কবর দেওয়া হবে ওদেরই মাটিতে। আমাদের বাড়ির পেছন দিকে যে রুশ সেনাটি পাহারা দিচ্ছিল, হঠাৎ তার দিকে আমার চোখ পড়ল। তার চেহারাটা শান্ত, সমাহিত। তাকে দেখে আমার মনে হল, এই লোকটি অবিনশ্বর। সে হয়তো কোনও এক দিন মারা যাবে, কিন্তু তার টুপিতে আটকানো ওই তারাটা অনন্তকাল জ্বলজ্বল করবে।

জুন ১৯৪১

লজ্জায়, ঘৃণায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিলাম। মা-মেয়েদের, বয়স্ক মানুষদের সমানে কিল-চড়-লাথি-ঘুষি মেরে যাচ্ছিল গুন্ডাগুলো। আমি জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একটা চাপা রাগ তৈরি হচ্ছিল মনের মধ্যে। দেখছিলাম, কী ভাবে আমাদের অসহায়তা, আমাদের নিঃসঙ্গতা মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। আমাদের হয়ে বলার জন্য কি কেউ নেই! আর আমরা? আমরা নিজেরাই অসহায়, কী প্রচণ্ড অসহায়! বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। আমরা হেরে গিয়েছি। আমরা একা। রসিকতার খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা। শুধু অপমানের জ্বালা বয়ে বেড়াচ্ছি।

(চলবে)